Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-2 January 2026

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস

সুচিত্রা কড়ার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/11_Suchitra-Karar.pdf

সারসংক্ষেপ: কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্মে এক প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম সমাজের অন্যায় বৈষম্য, কদর্য ভণ্ডামি এবং শোষিত মানুষের প্রতি আবদ্ধ। একজন কবির রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁর কবিতার রাজনীতি যে একাত্ম, এই বিশ্বাসেই তিনি সাহিত্য রচনা করতেন। তাঁর গভীর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র সমসাময়িক সমাজেই সীমিত ছিল না, বরং তিনি বাঙালির সুদূর অতীতের ইতিহাসেও এই শ্রেণি সংগ্রামের ধারা এবং জনজীবনের নিরন্তর প্রবাহকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তা কীভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রতিফলিত করেছে — তা আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস, সেনযুগ, পালযুগ, তুর্কিবিজয়, বিভিন্ন জনজাতি।

১

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের শুরু হয় আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিভূমি হিসেবে পরিচিত জনপদগুলোর মাধ্যমে। নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন, এই আঞ্চলিক পরিচয়ই দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির রাজনৈতিক ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন বাংলা মূলত পুণ্ড্র (বরেন্দ্রী), রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি জনপদ দ্বারা বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ জনপদের নামকরণ হয়েছিল প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে। জনপদগুলো ছিল স্বতন্ত্র ও পৃথক, যদিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও বিরোধের সম্পর্ক দেখা যেত। জনপদগুলোর আয়তন ও সীমানা ছিল পরিবর্তনশীল, যা ভৌগোলিক পরিবর্তন (নদীর ভাঙা-গড়া) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার বা হ্রাসের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবর্তিত হতো। যেমন, পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র দশম শতক থেকে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে পরিচিতি লাভ করে। রাঢ় অঞ্চল গঙ্গা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল, যা উত্তর রাঢ় সুহ্মভূমি ও দক্ষিণ রাঢ় বজ্রভূমি নামে পরিচিত — আমাদেরই প্রাচীন বাংলার পরিচয়।

২

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), 'পদাতিক কবি' হিসেবে বাংলার সাহিত্য জগতে পরিচিত, তিনি সৃষ্টিশীল লেখক; তাঁর জীবন ও কর্মে প্রগতিশীল রাজনৈতিকতার ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণা বা সংক্ষেপণ তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠাকে সর্ব প্রথম গুরুত্ব দিতেন তারপর সৌন্দর্যের কথা বলতেন, তাঁর কাছে ঐতিহাসিক সত্য ছিল সমাজবাস্তবতার প্রতি নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিকে ব্যবহার করে তিনি শ্রেণি-সংগ্রামমূলক রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ড. নীহাররঞ্জন রায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব'এর সংক্ষেপণ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় প্রচলিত রাজানুক্রমিক ইতিহাসের পরিবর্তে বাঙালির সমাজ ও জনজীবনের কাঠামোকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই মৌলিক কাঠামোটি গ্রহণ করে নিজস্ব মার্কসবাদী ও জনমুখী ব্যাখ্যার সেখানে প্রবেশ ঘটিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক রচনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি ও ইতিহাস ক্ষমতা কেন্দ্রে থাকা রাজন্যবর্গের নয়, তা প্রান্তিক জনগণের নিরন্তর সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এবং অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলার-

ইতিহাসকে সরিয়ে বাঙালির জনসমষ্টির গঠন, নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণ, অন্ত্যজ শ্রেণির অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাকে রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে, ইতিহাস ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু জনগণের সংমিশ্রণ ও সংগ্রামের মধ্যেই বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল প্রবাহমান ধারা বয়ে চলেছে।

৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তা বাঙালি জাতির বহুত্ববাদী এবং মিশ্র প্রকৃতির উপর জোর দেয়। এই নৃতাত্ত্বিক আলোচনা উচ্চবর্গীয় জাতির বিশুদ্ধতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপণে বাঙালির প্রকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যারা 'ভেড্ডিড' বা ভেড্ডাপ্রতিম মানুষ নামে পরিচিত, তাদের বর্ণনা দিয়েই শুরু করেছেন, "তাদের ছোট্টখাট্ট চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক চ্যাটালো"[১] নৃতাত্ত্বিকেরা এদের দেহের গড়ন দেখে নির্ধারণ করেছেন যে এই ভেড্ডিডরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী, এই বর্ণনা সিংহলের ভেড্ডা বা বেদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। এই আদিবাসী পরিচিতি একটি বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে, এমনকি ভেড্ডিড রক্তধারা শুধু মালপাহাড়ী, সাঁওতাল, ওরাঁও বা মুণ্ডার মতো আদিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, নমশূদ্র, পোদ, বাউড়ি, বাগদী, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই উপাদান প্রবলভাবে মিশে আছে। এমনকি বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের মতো উচ্চবর্ণের মধ্যেও কমবেশি ভেড্ডিড উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। একেই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর, ঐতিহাসিকভাবে উচ্চবর্ণের রাজনীতি সর্বদা ইন্দো-আর্য শ্রেষ্ঠত্ব বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশুদ্ধতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ ব্যবহার করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই ধারণাকে বাতিল করেছেন। 'ভেড্ডিড' জনগোষ্ঠী, যারা প্রথাগতভাবে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে, তারাই যদি বাঙালির মূল নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি হয়, তবে উচ্চবর্ণের 'ইন্দো-আর্য' দাবি কেবল একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ মিশ্রণ। এই বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ভিত্তিকে আদিম জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ কবির। এটি প্রমাণ করে, বাংলার জনগণ জন্মগতভাবে বহুমিশ্রিত এবং কোনো একক, বিশুদ্ধ 'আর্য' রক্তধারা এখানে আধিপত্য বিস্তার করেনি। অন্যদিকে, পশ্চিমে আগত ইন্দো-আর্য "দেহের বলিষ্ঠ গড়ন, গৌরবর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, লম্বা মাথা, লম্বা সরু নাক, কটা চোখ।"[২] এবং শক-পামিরীয় "দেহের মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, মাথার পিছন দিকটা চ্যাপটা খাড়াই, লম্বা নাক, ঈষৎ পীতাভ চোখ"[৩]এই উপাদানগুলি প্রধানত উচ্চবর্ণের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছে। আবার পূর্বে মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান উপাদান "গোল বা মাঝারি মাথা, বাঁকা চোখ, দেখতে ছোটোখাটো, গায়ের রং ময়লা"[৪] বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। নানা জাতি ও রক্তের এই বিচিত্র মেলামেশার ফলে কালক্রমে বাঙালির একটি নিজস্ব গড়ন দাঁড়িয়ে গেছে, যাকে বলা হয় 'পাঁচমেশালী'। এই মিশ্রণের ফলেই অধিকাংশ বাঙালির চেহারাই "মাঝারি গোছের — মাথার গড়ন লম্বাও নয় গোলও নয়, নাক লম্বাও নয় চ্যাপটাও নয়, মাথায় লম্বাও নয় বেঁটেও নয়।"[৫]এই মাঝারি গড়নকেই 'মার্কামারা বাঙালির চেহারা' বলা হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রধান দিক হলো, তিনি রাজকীয় রাজনীতির অস্থিরতাকে জনজীবনের স্থিতিশীলতা ও শক্তির বিপরীতে স্থাপন করেছেন। বহিরাগত রাজবংশগুলি যেমন — মালব, চোড়, খস, হুণ, কম্বোজ, সেন বারবার বাংলা আক্রমণ করেছে এবং রাজত্ব করেছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে, বাংলার বিশাল জনসমুদ্রে জলবিন্দুর মতো হারিয়ে গেছে বা 'তলিয়ে গেছে'। এই রাজবংশগুলির উত্থান-পতন ছিল ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মূল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে তারা বদলাতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো, ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা রাজতন্ত্রগুলি ছিল একটি ভঙ্গুর উপরিকাঠামো মাত্র। আসল রাজনৈতিক শক্তি নিহিত ছিল সেই 'জনসমুদ্রের' মধ্যে যা বহিরাগতদের হজম করে নেয় এবং নিজের মৌলিক চরিত্র ধরে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, রাজবংশ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বা 'ভেতো বাঙালি' পরিচয় আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাই বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি, তা রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক ইতিহাসকে বাতিল করে জন-কেন্দ্রিক ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করে।

৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাল ও সেন রাজবংশের বিশ্লেষণ আমরা পাই। পালযুগ কিছুটা দেশীয় রাষ্ট্রশক্তির সূচনা করলেও, সেনযুগের শাসনকে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাল রাজবংশ প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করেছিল এবং তারাই প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশীয় রাজশক্তি ছিল। আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম সত্তা হিসেবে পাল বংশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পালযুগে রাজনীতি নৈরাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এবং জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে বিভাজন ও হিংসা-দ্বেষ খুব একটা ছিল না। এক সমন্বয়ের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের সুযোগ দিয়েছিল। তবে এই সময়েও রাজকীয় ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে কর্ণাট, লাট, হুণ, খস প্রমুখ বিভিন্ন স্থানের লোকজনের আগমন ঘটেছিল, যদিও এই মিশ্রণ ছিল প্রশাসনিক প্রয়োজনে, কিন্তু এর প্রভাব সীমিত ছিল না।

৫

পাল বংশের পতনের পর একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাংলায় সেন বংশের উত্থান ঘটে। সেনরা ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে আগত 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। তারা প্রায় দু'শো বছর (আনুমানিক ১০৯৭-১২২৫ খ্রি.) বাংলা শাসন করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণে সেন রাজত্বের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব ছিল তাদের দ্বারা আরোপিত সামাজিক কাঠিন্য। সেন বংশ বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর বাংলার সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে, সমাজের উচ্চস্তরে এক নতুন সমাজবিন্যাস গড়ে তুলেছিল। এই নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা প্রগতিশীল মিশ্র সমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদী কঠোর কাঠামোয় আবদ্ধ করে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সেনদের মূল 'রাজনৈতিক অপরাধ' ছিল জনগণের উপর আরোপিত কঠোর শ্রেণিবৈষম্য। সমাজে শূদ্রদের কাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন শ্রেণির সেবা করা, যার ফলে বিভিন্ন সংকরজাতি বা অন্ত্যজ শ্রেণির সৃষ্টি হয়। সেন রাজারা এই অন্ত্যজ শ্রেণি এবং 'বোট' শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। পালদের সমন্বয়বাদী রাজনীতির বিপরীতে সেনরা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইন্দো-আর্য উপাদানকে জোর করে উচ্চ সামাজিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করে, জনমুখী রাজনৈতিক চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়। এই আরোপিত কাঠিন্য এবং জনগণের প্রতি রাজনৈতিক উপেক্ষা তাদের পতনের পথ তৈরি করে। শ্রেণি শোষণের পাশাপাশি সেন রাজাদের সাংস্কৃতিক নীতিও ছিল জনবিচ্ছিন্নতার আর এক কারণ। সেন রাজারা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রজার মুখের ভাষা বা প্রাকৃত ভাষাকে উপেক্ষা করে সংস্কৃত ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। লক্ষ্মণ সেন নিজেও পন্ডিত ছিলেন এবং জয়দেব, ধোয়ীর মতো সংস্কৃত কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কেবল উচ্চবর্গের সংস্কৃত দিকে ঝুঁকে থাকায় রাজা-প্রজার মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়। এই দূরত্ব সেন রাজবংশের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছিল, যা তাদের রাজনৈতিক পতনে ভূমিকা রাখে।

৬

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইতিহাসে তুর্কি আক্রমণের ঘটনাকে উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে না দেখে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জন্য একটি সম্ভাব্য মুক্তির অনুঘটক হিসেবে দেখেছেন। তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বেই বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সমাজ ছিল বিলাস, শোষণ এবং পুরোহিততন্ত্রে পীড়িত। রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাজা-প্রজার মধ্যে কোনো সংযোগ বা ঐক্য ছিল না, কারণ সেন রাজারা অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি উদাসীন ছিলেন। যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন (আনুমানিক ১২০২-১২০৩ খ্রি.), তৎকালীন রাজা লক্ষ্মণ সেন আত্মরক্ষার্থে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। যেহেতু সেন রাজাদের কঠোর শাসন সাধারণ মানুষকে নিপীড়িত করেছিল, তাই এই রাজনৈতিক বিপর্যয় সমাজের নিপীড়িত অংশকে মুক্তির পথ দেখানোর সুযোগ করে দেয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টিকে সাধারণত 'শূন্যতার যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই চিরায়ত ঐতিহাসিক অভিযোগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এই সময়টি আসলে স্থিতিশীল উচ্চবর্গীয়

সাংস্কৃতির পতন এবং নতুন, জনমুখী সাংস্কৃতিক ধারার প্রাক্-প্রস্তুতির কাল ছিল। রাজনৈতিকভাবে, এটি শোষক সেন রাজত্বের সমাপ্তি এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সূচনা করে।

তুর্কি আক্রমণের ফলে সমাজের অসাড় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ভেঙে গেল। ধ্বংস ও লুটপাট সত্ত্বেও, এটি পতনোন্মুখ, শোষণ-পীড়িত সমাজের উপর আঘাত হিসেবে কাজ করে যা পুরাতন কাঠামোকে ভেঙে দেয়। এই পতনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যেমন, তুর্কি বিজয়ের পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার বিস্তার শুরু হয়। জনগণের ভাষার এই মুক্তি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ এটি উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। মধ্যযুগের (১৩৫০-১৮০০ শতাব্দী) সূচনা এই আক্রমণের পরেই ঘটে। রাষ্ট্রীয় নজরদারি কমে যাওয়ায়, সাহিত্য ও সমাজে নতুন জীবনের অদ্ভুত উন্মেষ দেখা যায়। এই সময়েই মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ এবং সাধারণ লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যখন রাজকীয় ক্ষমতা অপসৃত হয়, সেই রাজনৈতিক শূন্যতায় সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শক্তিকে সামনে তুলে ধরে। এর ফলে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং সাহিত্য ধারা চরম বিকাশ লাভ করে। এটি নির্দেশ করে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যর্থতা জনগণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষমতার উত্থানের সুযোগ করে দেয়। এই প্রক্রিয়াটিই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসে জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে বিবেচিত।

৭

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণা তাঁর চূড়ান্ত রাজনৈতিক বার্তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর দৃষ্টিতে, ইতিহাস কেবল তথ্যের সংরক্ষণ নয়, বরং ভবিষ্যৎ বিপ্লবের প্রস্তুতি। তাঁর কাছে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস রাজা-মহারাজা বা রাজবংশের বংশানুচরিত নয়। এটি হলো জনসমষ্টির নিরন্তর সংমিশ্রণ, বহু সংস্কৃতির সমন্বয়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভেড্ডিড আদিবাসী মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত শোষিত শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ছিল সেই চেংমান-চাষির ইতিবৃত্তের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা, যারা তেজারতি-বন্ধকির কারবারে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, একজন কবির কলমকে ‘ট্র্যাক্টরের পাশে নামিয়ে রেখে’ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ইতিহাস রচনার লক্ষ হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। তিনি মনে করেন, সেই জনসমুদ্রই প্রকৃত রাজনৈতিক সত্তা, যা সকল বহিরাগত শক্তিকে অতিক্রম করে নিজের মৌলিক চরিত্র রক্ষা করে চলেছে। এই সংগ্রামের মূল দ্বন্দ্ব ছিল লোকবৃত্ত উদার, সমন্বয়ী সমাজ এবং রাজবৃত্ত কঠোর, আরোপিত কেন্দ্রীয় শাসন এর মধ্যে। গোপালের নির্বাচন প্রমাণ করেছিল, রাষ্ট্র যখন সমাজের প্রয়োজনে গঠিত হয় তার দীর্ঘ শাসন স্থিতিশীলতা লাভ করে যেমন পালবংশ। বিপরীতক্রমে, সেনদের আরোপিত ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন এবং সামাজিক বিভেদ লোকায়ত ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল, যার ফলে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস আসলে সাধারণ মানুষের স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। রাজবৃত্তকে ইতিহাসের কঙ্কাল এবং লোকবৃত্তকে তার রক্ত মাংস হিসেবে দেখা হয়। এই কঙ্কাল যদি সুদৃঢ় না হয়, তবে কেবল রক্ত-মাংস দ্বারা ইতিহাসের যথার্থ আকৃতি ও স্বরূপ গঠিত হতে পারে না, যার ফলস্বরূপ রাজবৃত্তবিহীন সময়ের লোকবৃত্তও প্রায়শই অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র নয়; বরং সমসাময়িক সমাজেরই রূপ রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। সেই সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস ব্যাখ্যার কেন্দ্রীয় বিষয় শ্রেণি-চেতনা। তাঁর কবিতা যেমন সমাজের অন্যায় বৈষম্য এবং ভণ্ডামির দিকে আঙুল তোলে, তেমনি তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যার মূল লক্ষ, কীভাবে যুগ যুগ ধরে বহিরাগত ইন্দো-আর্য এবং পরে স্থানীয় শোষক শক্তি সেন রাজত্ব বাংলার আদি জনধারাকে নিপীড়ন করেছে। সেন রাজত্বের পতনকে নেতিবাচকভাবে না দেখে ইতিবাচক ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে দেখা হয়, তা

শ্রেণি-সংগ্রামেরই একটি অংশ। এটি বস্তুবাদী ইতিহাসের এমন এক পাঠ যেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ তৈরি করে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস কোনো রাজকীয় উত্তরাধিকারের গল্প নয়, বরং তা হলো সেই জনসমুদ্রের আখ্যান, যারা সময়ের স্রোতে বহু রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি 'মার্কামারা বাঙালি' সত্তা তৈরি করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি ভেড্ডিড মূল এবং সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব 'ভেতো বাঙালি' পরিচয় প্রমাণ করে, সমাজের শোষিত ও নিম্নবর্গই ছিল ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক Legacy এই শিক্ষাই দেয় যে, ক্ষমতা এবং রাজনীতিকে কেবল উপরিকাঠামোর পরিবর্তন হিসেবে দেখলে চলবে না। রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত ধারা নিহিত থাকে সমাজের গভীর স্তরে, যেখানে নৃতত্ত্ব, ভাষা এবং শ্রেণি সংগ্রাম এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। তাঁর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল কেবল অতীতকে জানা নয়, বরং শোষণের প্রক্রিয়াগুলিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য জনচেতনাকে প্রস্তুত করা। কবির চোখে বাঙালির ইতিহাস শুধুই রাজবংশকেন্দ্রিক নয় বরং তার মূল শিকড়টি বহু মিশ্র রক্তধারার সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ মানুষের মধ্যে নিহিত।

তথ্যসূত্র:

১. 'বাঙালির ইতিহাস', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রকাশ আকাদেমি সংস্করণ ২৭ জানুআরি ১৯৯৯, সপ্তম মুদ্রণ ২০২৩, পৃ. ১
২. ওই, পৃ.৩
৩. ওই, পৃ.৩
৪. ওই, পৃ.৩
৫. ওই, পৃ.৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায় সুভাষ, 'বাঙালির ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সংস্করণ ২৭ জানুআরি ১৯৯৯, সপ্তম মুদ্রণ ২০২৩
২. মুরশিদ গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', অবসর, ৪৬/১,৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৬
৩. হালদার গোপাল, 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য ও ড. অরুণা হালদার সম্পাদিত, মনীষা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬০
৪. রায় নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব', দি বুক এম্পোরিয়াম, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯

লেখক পরিচিতি: সুচিত্রা কড়ার, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।